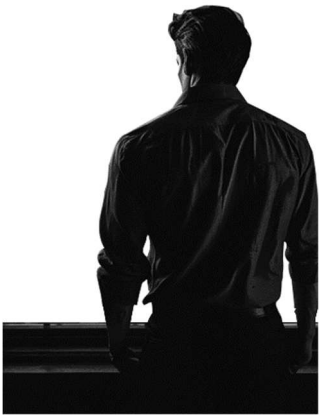

‘শহর থেকে এত দূরে এই জঙ্গলের মধ্যে আমাকে নিয়ে আসার মতলবটা এখন আমি বুঝতে পারছি।’

‘মতলব বলছ কেন! তোমার কবি তোমাকে প্রকৃতির মধ্যে দেখতে চেয়েছে, দেখতে চেয়েছে তুমি এবং প্রকৃতি কার চেয়ে কে বেশি আদিম।’

‘খুব ভালো কথা, কিন্তু সেটা দেখতে গিয়ে কবি নিজেই আদিম হয়ে উঠছে, আর ধীরে ধীরে কবি বর্বর হয়ে উঠছে।’

‘কি যা তা বলছ, আমি তোমার সঙ্গে বর্বরতা করছি!’

‘হ্যাঁ তাইতো করছ! এই যে তুমি আমার হাত ধরে আছ আমি তোমার স্পর্শের মধ্যে হিংস্রতা টের পাচ্ছি...’

ঘাড় ঘুড়িয়ে জেনিফার কবি অনিন্দ্য আকাশের চোখের গভীরে তির্যক দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। জেনিফারের দৃষ্টিটা এখন উত্তর মেরুর হিম আর ঈষৎ ছড়িয়ে পড়া হাসিতে সাহারার লু হাওয়া। কবি অনিন্দ্য আকাশ একই সঙ্গে দুটোর তীব্রতাই টের পাচ্ছে। এতক্ষণ নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে রেখেছিল জেনিফারের হাত, কিন্তু এখন মুঠো আলগা করতে গিয়ে দেখে সেটা বেশ শক্তি দিয়েই চেপে ধরে আছে জেনিফার। অদৃশ্য অপমানের শাস্তিটা তাকে শীতল করে দিচ্ছে।

এই গুমোট অস্বস্তিটা হালকা করার জন্য একটা ফেক হাসি দিয়ে কবি অনিন্দ্য আকাশ বলে—

‘কবির স্পর্শ রূপকথার সেই জীবনকাঠির মতো, যার স্পর্শে জেগে ওঠে নারী ও প্রকৃতি।’

‘তোমার কথা সত্যি প্রিয় কবি, তবে কবির শরীরের স্পর্শে নয়, কবির কবিতার মধ্যেই জেগে ওঠে নারী ও প্রকৃতি। আমি তোমার হাতের স্পর্শের চেয়ে তোমার কবিতার স্পর্শ বেশি উপভোগ করি...’

ধরা পড়ে গেছে কবি অনিন্দ্য আকাশ, গত এক মাসের শ্রম মেধা আর পরিকল্পনা সব ভেস্তে গেল।

তবে রক্ষা জেনিফার এখন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছে। যেন দয়া করে এই স্পেসটুকু কবিকে দিয়েছে, যেন সে লুকাতে পারে। আবেগ-অনুভূতি লুকিয়ে রেখে যেভাবে বিচারক মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে ঠিক সেভাবে বহুদূরের দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই জেনি বলে—

‘রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে নারীকে নিষ্পাপ স্পর্শ করা যায় না হে কবি। নারীর মন স্পর্শ না করে তার দেহ স্পর্শ করাটাই বর্বরতা।’

এক অপ্রতিরোধ্য মোহে আটকা পড়েছে কবি অনিন্দ্য আকাশ। এ পর্যন্ত সাতটি কাব্যগ্রন্থ বের হয়েছে তার। গত তিন বছরে তিনশ কবিতা আর তিনটি কাব্যগ্রন্থ পুরোটাই জেনিফারকে কেন্দ্র করে লিখেছে সে। জেনিফার কবিতায় মুগ্ধ। এই মুগ্ধতা অকৃত্রিম। যেমন অকৃত্রিম অনিন্দ্য আকাশের কবিতা। কবিতার প্রতি জেনিফারের মুগ্ধতা আর সেই কবিতার কবির প্রতি তার অনুভূতিকে কোনোভাবেই মেলাতে পারে না অনিন্দ্য আকাশ। মুগ্ধ করে জেনিফারকে নিজের করে পেতে চেয়েছিল কবি। মুগ্ধ করতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু জেনিফারের হৃদয়কে জয় করতে পারেনি এখনো।

কবি জেনেছে হৃদয় জয়ের জন্য শুধু মুগ্ধতাই একমাত্র অস্ত্র নয়, আরও কিছু লাগে, সেটা কী এখনো ধরতে পারেনি। কবির জন্য এ দারুণ কষ্টের।

আর জেনিফারের বিশেষত্ব এখানেই, সে তার বিশ্বাসের বাইরে এক চুলও নড়ে না। এমনই কঠিন আদিম মোহের জালে আটকা পড়েছে কবি অনিন্দ্য আকাশ। তবে এটা নিশ্চিত যে সে জেনিফারকে ভালোবাসে, এই মুহূর্তে সে জেনিফারের জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এ কথা সে জেনিফারকে এত সহজে ঠিক এভাবে বলতে পারে না। সে যা বলে সব বলে কবিতায়। আর জেনিফার জানে কবিতার ভেতর দিয়ে কবি যা বলছে তার সবটাই সত্যি, সবটাই তার উদ্দেশে বলা। কিন্তু আর বাকি সব এমন সত্য নয়। যা সত্য নয়, তা জেনিফারকে স্পর্শ করে না। সত্য-মিথ্যের বিষয়ে এই স্পর্শকাতরতা জেনিফার পেয়েছে তার পরিবার থেকে। জেনিফারের বাবা কবি ছিলেন। ইংল্যান্ডে পড়তে গিয়ে জেনিফারের মায়ের সাথে হয় পরিচয়, প্রেম, তারপর বিয়ে। মা খাঁটি ব্রিটিশ আর বাবা খাঁটি বাংলাদেশি, দুই সংস্কৃতির আভিজাত্যের দুটিই পেয়েছে জেনিফার। জেনিফার যখন শুদ্ধ এবং প্রমিত বাংলায় কথা বলে তখন কোনোভাবেই বোঝার উপায় থাকে না যে ওর জন্ম আর বেড়ে ওঠা ইংল্যান্ডে। তার কবি বাবা তাকে সাহিত্য পড়িয়েছে। শেক্সপিয়র, বায়রন, ব্লেক, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মিল্টন, জর্জ ইলিয়ট আর রবার্ট ব্রাউনিংয়ের পাশাপাশি পড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, আল মাহমুদ, শামসুর রহমান, শহীদ কাদরী।

সাহিত্যে গ্র্যাজুয়েশন করেছে ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ থেকে। ইংল্যান্ডে বসে বহুদূরের বাংলাদেশকে তার মনে হতো কবিতার দেশ। বাংলা গান আর কবিতায় আকণ্ঠ ডুবে থাকত। অনলাইনে ব্লগে খুঁজে খুঁজে পড়ত সমসাময়িক কবি আর কথাসাহিত্যিকদের সর্বশেষ লেখা। তখন থেকেই কবি অনিন্দ্য আকাশ নামটা তাকে আকর্ষণ করেছে। মুগ্ধ হয়েছে ওর কবিতা পড়ে। ম্যাসেঞ্জারে নিয়মিত চ্যাট হতো বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে কবিতা নিয়ে। এরই মধ্যে নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে অফার এসেছে টিচিংয়ের জন্য, জয়েন করেছে ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ অ্যান্ড মর্ডান ল্যাংগুয়েজ ফ্যাকাল্টিতে। বাংলাদেশে থাকার এই সুযোগটা আর হাতছাড়া করেনি জেনিফার। ওর বাবাও উৎসাহ দিয়েছে। ওর বাবা শেষ জীবনটা বাংলাদেশে কাটাতে চায়। বাবা-মার ছাড়াছাড়ি হয়েছে বেশ অনেকদিন। তার মা আবার বিয়ে করে এখন ফ্রান্সে থাকে। জেনিফার তার বাবার সাথেই থাকত। বাবার শিক্ষা আর নৈতিক মূল্যবোধের ভেতর দিয়েই সে বড় হয়েছে, বিয়ে ছাড়া যৌনতাকে পাপ বলে বিশ্বাস

করতে শিখেছে। যত বড় হয়েছে ততই বদ্ধমূল হয়েছে তার সেই বিশ্বাস। এই কারণে তার ব্রিটিশ বয়ফ্রেন্ড তাকে বলত 'বোরিং'। ঠিক এই মুহূর্তে অনিন্দ্য আকাশের চেহারার মধ্যে মার্টিনের বলা 'বোরিংটা' ঝুলে আছে। হঠাৎ জেনিফারের খুব হাসি পেল। অনেক কষ্টে সে হাসিটা লুকিয়ে ফেলল। বোরিং নারী নিয়ে অসহায় পুরুষদের করুণ চেহারাটা জেনিফারকে ভেতরে ভেতরে খুব হাসাচ্ছে। তবে মার্টিন অনেক সহজ সরল ছিল, মুখ ফুটে বলে দিতে পারত, অনিন্দ্য আকাশ যেমন গভীর তেমনটাই জটিল। কিন্তু জেনিফার তাকে পড়তে পারে। দূর থেকে যখন অনলাইন চ্যাটিং-এ অথবা ফোনে কথা হতো তখনকার মুগ্ধতা, সাক্ষাতের প্রথম দিনেই হোঁচট খেয়েছিল, জেনিফার যখন জেনেছিল কবি অনিন্দ্য আকাশের পৈত্রিক নাম আবুল খায়ের প্রামানিক। জেনিফার শুনে অবাক হয়েছিল যে তার বাবার দেওয়া নামটা নাকি সাহিত্য সমাজে ঠিক যায় না। লেখকদের ছদ্ম নামে লেখার একটা চল থাকলেও মাটির গন্ধ থেকে ঝেড়ে মুছে নিজেকে আরবান করে তোলার এই প্রচেষ্টা জেনিফারের ভালো লাগেনি। যদিও জেনিফার বুঝেছে কবিদের কোনো নিয়মে বাঁধা যায় না। অনিন্দ্য আকাশের কবিতার মধ্যে যে জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়, যে দ্রোহ প্রতিবাদ আর মানবতার মুক্তির গান পাওয়া যায় তার কাছে এই ভালো না লাগাটা গুরুত্ব পায়নি।

হঠাৎ একটা চাপা শব্দে ওদের সংবিৎ ফেরে। এতক্ষণের গুমোট মুহূর্তগুলো নিমেষে তরল হয়ে যায়। শব্দের উৎস খোঁজার জন্য দুজনে একসাথে পেছনের দিকে ঘুরে তাকায়।

অনেক খোঁজখবর লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত কবির এই জায়গাটা পছন্দ হয়েছিল। গাজীপুরের ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্কের ভেতর দিয়ে পূর্বদিকে শালবনের মধ্য দিয়ে প্রায় আধাঘণ্টা হেঁটে পার্কের সীমানা পার হয়েও আরও কিছুটা হাঁটলে হঠাৎ দেখা মেলে একটা শাখা নদীর। শালবনের ভেতর দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে অদ্ভুত এক নৈসর্গিক দৃশ্য তৈরি করে আবার হঠাৎই যেন জঙ্গলের ভেতরে হারিয়ে গেছে নদীটা। সারপ্রাইজ দেবে বলে আগে থেকে জেনিফারকে কিছুই বলেনি কবি। জঙ্গল সব সময়ই জেনিফারের প্রিয়। ঢাকা শহরের এত কাছে এমন একটা জঙ্গল পেয়ে জেনিফার মুগ্ধ হয়েছিল। আর আধাঘণ্টা হাঁটার পর যেখানে ওরা এসে পৌঁছেছে সেই জায়গাটা আক্ষরিক অর্থেই অসাধারণ। জেনিফারের মুগ্ধতা কবিকে সাহসী করে তুলেছিল। জায়গাটা খুবই নির্জন। এদিকটায় মানুষজন খুব একটা আসে না। এমনকি নদীর পাড় পর্যন্ত পৌঁছাতে ওরা কোনো পায়ে হাঁটা পথও খুঁজে পায়নি। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে আর গায়ে মাথায় মাকড়সার জাল আর পাখির ঝরা পালক নিয়েই ওরা সেখানে পৌঁছেছে। কবি তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে করে নিয়ে এসেছে একটা প্লাস্টিকের ম্যাট, জেনিফারের প্রিয় চিপস, কফির ফ্লাস্ক আর পানির বোতল। জেনিফারের মুগ্ধতা দেখার জন্য এসব পাগলামো দেখে কবির জন্য এক অদ্ভুত ভালো লাগা অনুভব করছিল জেনিফার। কবি অনিন্দ্য আকাশ সেটা টের পেয়েছিল। এই জঙ্গলের নির্জনতা আর পাশে বসা কাঙ্ক্ষিত নারী কবিকে ভেতরে ভেতরে তছনছ করে দিচ্ছিল। আজই প্রথম

কবি অনিন্দ্য আকাশ তালুবন্দি করেছে জেনিফারের হাত। কিন্তু জেনিফারের প্রতিক্রিয়াটা এমন অদ্ভুত হবে, কোনোভাবেই ধারণা করতে পারেনি। এতক্ষণ জেনিফারের যুক্তির কাছে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে কবি। জেনিফারের নীরবতা আর এখানকার নৈসর্গিক নির্জনতা দুটো একসাথে যেন কবি অনিন্দ্য আকাশকে চাবুক পেটা করছিল।

হঠাৎ ভেসে আসা চাপা শব্দটা যেন কবির জন্য ত্রাণকর্তা হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ আগের গুমোট অবস্থাটা দ্রুত কাটানোর জন্য খুব তৎপর হয়ে উঠল কবি অনিন্দ্য আকাশ। একটা অস্বাভাবিক শব্দ হয়েছে এ ব্যাপারে ওরা দুজনেই নিশ্চিত। এই পরিবেশে শব্দটাকে পাত্তা না দিয়ে কোনো উপায় নেই। দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছে। ওরা লম্বা লম্বা কাশবনের ঝোপ আর ঘাসের মধ্যে ম্যাট বিছিয়ে বসে ছিল। শুধু সামনের নদীর দিকটা ছাড়া পুরোটাই ছিল সবুজের বেষ্টনী। কানখাড়া করে ওরা দুজন তাকিয়ে আছে দুজনের মুখের দিকে। এবার শব্দটা আরও স্পষ্ট হলো। শাখা নদীটা জঙ্গলের যেদিকটায় বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে শব্দটা আসছে সেদিক থেকে। শব্দটা আরও এগিয়ে আসছে, স্পষ্ট শোনা গেল কেউ যেন গোঙাচ্ছে, অনেকটা আর্তনাদের মতো। আর সাথে সাথে একটা চাপা ধমকের মতো শব্দ। একটা অজানা আশঙ্কায় ঘাবড়ে গেছে কবি অনিন্দ্য আকাশ। এই মুহূর্তে ঠিক কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারছে না। লোকালয় থেকে দূরে এমন নির্জন জায়গা তার উপর সাথে রয়েছে জেনিফারের মতো এমন আকর্ষণীয় এক নারী। নিজেদের নিরাপত্তার এই বিষয়টা জেনিফারকে নির্জনে পাওয়ার উত্তেজনায় কবির মাথায় আসেনি।

'মনে হচ্ছে খুব সিরিয়াস কিছু একটা।'

জেনিফারের কথায় যেন ঘোর ভাঙে কবির।

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

চাপা আর্তনাদের সাথে সাথে এখন দু-একজন মানুষের অস্পষ্ট কথার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে।

জেনিফার বলল, 'চলো একটু এগিয়ে দেখি।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো কবি। জেনিফারের সামনে কোনোভাবেই নিজের দুর্বলতাকে প্রকাশ করা যাবে না।

নদীর তীর বরাবর বাঁকের দিকে লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে আর খুব সাবধানে ওরা এগোতে থাকে। কিছুদূর আগানোর পর পেছনে ফিরে কবি তাকিয়ে দেখে জেনিফার ঘাড় বাঁকিয়ে তার বামে ঝোপের দিকে স্থির পাথরের মূর্তির মতো তাকিয়ে আছে।

ফিসফিস করে ডাক দেয় কবি অনিন্দ্য আকাশ 'জেনিফার'। কোনো সাড়া নেই। কবি আবার ডাক দেয় 'জেনি'। এবারও জেনি কোনো সাড়া দেয় না, একই রকম স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। জেনির দৃষ্টিকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসে কবি। জেনির কাছে এসে

বামের ঝোপের দিকে তাকানোর সাথে সাথে কবি অনিন্দ্য আকাশের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

একটা ছোট গজারি গাছের গোড়া প্যাঁচিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ওদের দিকে স্থির তাকিয়ে আছে মিশমিশে কালো বিশাল একটা সাপ। গ্রামে বেড়ে ওঠা অনিন্দ্য আকাশ মুহূর্তেই চিনে ফেলল ভয়ংকর বিষাক্ত সাপটাকে, কাল্ কেউটে।

বিল জলাশয়ের মূর্তিমান আতঙ্ক এই সাপ। সময় যেন স্থির হয়ে গেছে। শিরশির করে একটা হালকা বাতাস বয়ে গেল ওদের উপর দিয়ে, নাড়িয়ে দিয়ে গেল কাশবনের ডগাগুলোকে, কিন্তু ওরা কেউ নড়তে পারছে না। নড়লেই যেন সাপটা তেড়ে আসবে। কামনা মানুষকে অন্ধ করে ফেলে। তাই এই জায়গাটার বিপদ সম্পর্কে কোনো চিন্তাই আসেনি কবি অনিন্দ্য আকাশের মনে। চাপা আর্তনাদটা এবার আরও তীক্ষ্ণ হয়ে কানে বাজল।

সাপটা যেন জেনিফারকে সম্মোহিত করে ফেলেছে।

খুব ধীরে ধীরে কবি চেপে ধরল জেনিফারের কব্জি, কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বলল, 'লেটস্ গো জেনি।'

ধীরে ধীরে ওরা যেন পরাজয় মেনে সাপের দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে গেল।

ঘন ঘাসের ভেতর এখন প্রতিটি পদক্ষেপই আতঙ্কের হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরের ভেতরে সাপের মতো পুরো ঘাসবনটাই যেন সাপে কিলবিল করছে।

চাপা আর্তনাদের শব্দটা এখন অনেক কাছ থেকে পাওয়া পাচ্ছে, ফলে সাপের আতঙ্কের জায়গায় দ্রুত জায়গা করে নিয়েছে মানুষের আতঙ্ক। ঘাসবনের ভেতর দিয়ে ওরা প্রায় কয়েক শ ফিট অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে বাঁকের শেষ প্রান্তে। কাশের ঝোপের ফাঁকফোকর দিয়ে অপর প্রান্ত একটু একটু দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কয়েকজন মানুষের নড়াচড়া। আরও একটু এগিয়ে একটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকে দুই হাতে ঘাসের ধারালো পাতা সরিয়ে ওরা বুঝে গেল, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা একটা খুনের সাক্ষী হতে চলেছে।

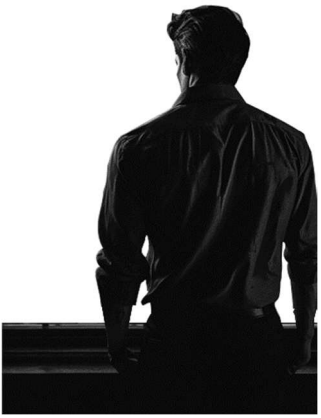

জাহাঙ্গীরকে ধরা হয়েছে দাউদকান্দি থেকে। কোকের সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাইয়ে তাকে আগেই অচেতন করে ফেলা হয়েছিল বলে বড় কোনো ঝঞ্ঝাট ছাড়াই তাকে জীবিত ধরা গেছে। তার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্যই তাকে জীবিত ধরাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দাউদকান্দি থেকে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যার চরে এক দিন রাখার পর আজ বালুর ট্রলারে করে আনা হয়েছে কালিগঞ্জে।

কালিগঞ্জের নির্জন বেলাই বিল পেরিয়ে জয়দেবপুরের চিলাই নদী দিয়ে নৌকায় করে নিয়ে আসা হয়েছে বনখোরিয়ায়। এটা শহীদ চেয়ারম্যানের এলাকা। জয়দেবপুর কালিগঞ্জ আর কাপাসিয়াকে ত্রিভুজের তিনকোণ ধরে হিসাব করলে এই ট্রায়াঙ্গেলে রয়েছে বিস্তীর্ণ জলাভূমি আর ফসলি জমিন। যার পশ্চিম প্রান্তরটা মিলেছে ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্কের পেছনে। অঞ্চলটা আক্ষরিক অর্থেই জনশূন্য। এই ট্রায়াঙ্গেল নিয়ন্ত্রণ করে শহীদ চেয়ারম্যান। স্থানীয়ভাবে তেমন কোনো অপরাধ ঘটে না বলে থানা পুলিশ নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়। বিচার-সালিশ যা করার সব করে শহীদ চেয়ারম্যান। উপরে উপরে দেখতে সাদামাটা নিরীহ এই অঞ্চলে সবার অলক্ষে কী ভয়ংকর কর্মকাণ্ড চলে তার খবর হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া আর কেউ জানে না।

শহীদ চেয়ারম্যান সরাসরি কোনো কাজে থাকে না। কিন্তু আজকের কাজটা খুব স্পেশাল। গত দশ বছরে এমন কাজ মাত্র তিনবার তাকে করতে হয়েছে।

এই টাইপের কাজের দায়িত্ব অন্য কারো হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। প্রতিবারই তাকে মূলত নৌকা চালানোর কাজটা করতে হয়। যেটা তার বর্তমান অবস্থান আর ব্যক্তিত্বের সাথে মোটেই যায় না। আজ রৌদ্রোজ্জ্বল ঝকঝকে দিন, অথচ বিলের এই প্রান্তে নৌকা নিয়ে ঢোকার পর থেকেই শহীদ চেয়ারম্যানের গাটা কেমন ছমছম করছে। এই অনুভূতিটার সাথে তার পরিচয় ছিল না। ৬৫ বছর বয়সটাকে সে পাত্তা দিত না, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সত্যিই তার বয়স হয়েছে। শহীদ চেয়ারম্যানের অতীত ইতিহাসটা আজ পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে বর্তমানের জনপ্রিয় চেয়ারম্যানের আড়ালে। গত ত্রিশ বছর ধরে সে এই অঞ্চলের চেয়ারম্যান। চাইলে উপজেলা চেয়ারম্যান এমনকি এমপি পর্যন্ত হতে পারত। কিন্তু শহীদ চেয়ারম্যান তার গণ্ডি অতিক্রম করেনি। এই পুরা ট্রায়াঙ্গেলে কোনো অপরাধী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সাহস করে না শুধু তার কারণে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ংকর খুনি এই কালিগঞ্জের ইমদু। রাজনীতিতে জাসদের হাত ধরে উত্থান ঘটে ইমদুর। মানুষ হত্যা করে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখত। মায়ের সামনে সন্তানকে হত্যা করত। এমনকি মানুষের মাথা কেটে ফুটবল বানিয়ে পৈশাচিক উল্লাস করত। শহীদ চেয়ারম্যান ছিলেন সেই ইমদুর দলের সর্বকনিষ্ঠ

সহযোগী। ইমদুর ফাঁসি হয়েছে, দলের অনেকে প্রতিপক্ষের হাতে খুন হয়েছে নয়তো দীর্ঘমেয়াদের জেল হয়েছে। বয়স কম থাকাতে শহীদ মাত্র দুই বছর জেল খেটে বের হয়ে গেছে। নিজে সেভাবে আর অপরাধজগতে ফিরে না গেলেও ওই অঞ্চলের সমস্ত অপরাধীরা তাকে জমের মতো ভয় পায়; সমীহ করে। চেয়ারম্যানের আড়ালে এক অদৃশ্য সাম্রাজ্যের অঘোষিত সম্রাটের মতো তার নিয়ন্ত্রণ পুরো অঞ্চলে।

শহরে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটলে সবার আগে খবর আসে শহীদ চেয়ারম্যানের কাছে। এসব কাজ তার আর ভালো লাগে না। খবর পাওয়ার সাথে সাথে অদ্ভুত এক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। বিলের ভেতর দিয়ে আসার সময় পশ্চিমের এই দিকটায় উঁচু উঁচু টিলার মতো আছে। সেসবের দিকে একটু ভালোমতো লক্ষ করলে কিছু কিছু মাটি মাছের পেটের মতো ফুলে থাকার চিহ্ন এখনো বোঝা যায়। কতশত হতভাগা সেইসব উঁচু হয়ে থাকা মাটির নিচে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে সে হিসেব শহীদ চেয়ারম্যান নিজেও দিতে পারবে না কোনোদিন। নৌকার যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছে শহীদ চেয়ারম্যান। আজ খুব অস্বস্তি হচ্ছে তার। কেন যেন কিছুক্ষণ পর পর গায়ের লোমগুলো কাঁটা দিয়ে উঠছে। নিজের কাছে নিজেকেই কেন যেন অপরিচিত ঠেকছে। এই জায়গায় এক মুহূর্তও তার থাকতে ইচ্ছে করছে না। এখানকার বাতাস কেন যেন অনেক ভারী ঠেকছে, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে অস্বস্তি লাগছে। আজ কাজ সারতে ওরা অনেক বেশি সময় নিচ্ছে। এত সময় লাগার কথা নয়। এক অঘোষিত পালাবদলের চক্রে আটকে পড়েছে শহীদ চেয়ারম্যানের জীবন। শেষবার এখানে আসতে হয়েছিল জাহাঙ্গীরের ডাকে। জাহাঙ্গীর তুলে এনেছিল সুব্রত কুণ্ডুকে। কুণ্ডু খুব কাকুতি-মিনতি করেছিল তাকে যেন গুলি করে মারা হয়। জাহাঙ্গীর তার সেই অনুরোধ রাখেনি। তাকে জীবিত মাটি চাপা দিয়েছিল। এটাই লাইনের নিয়ম। জাহাঙ্গীর নিয়ম ভাঙেনি। ক্ষমতার দাপটে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল জাহাঙ্গীরের দূরদৃষ্টি। সেদিন নিয়মটা ভাঙলে আজকে তার হয়তো যাওয়াটা আরামের হতো। জাহাঙ্গীর কী কুণ্ডুর মতো কাকুতি-মিনতি করছে! দেখতে পারলে তাকদিরের ফয়সালার বিষয়ে একটা অঙ্ক মেলাতে পারত। শহীদ চেয়ারম্যান নিজের জন্য নিয়ম ভেঙেছিল। আর নিজের জন্য সেই নিয়ম ভাঙার অঙ্কটা সে নিশ্চিত দেখে যাবে। কিন্তু ওরা আজ কাজ সারতে এত দেরি করছে কেন! ডেভিড কী জাহাঙ্গীরের শেষ অনুরোধটা রাখবে?

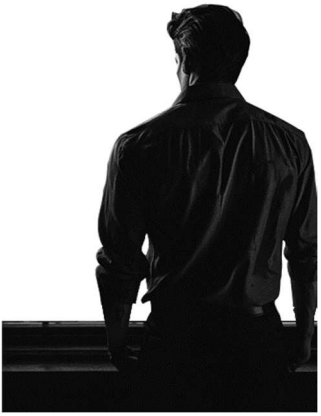

কোঁদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়ছে জনি। আলগা মাটিগুলো হাত দিয়ে তুলছে কিবরিয়া। তদারকি করছে আসলাম। এদের কারোরই গর্ত খোঁড়ার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

কাজ শুরু করার আগে জনি জিজ্ঞেস করেছিল গর্তের শেপটা কবরের মতো হবে কী না?

আসলাম ধমক দিয়ে বলেছে, 'আমরা কী সাথে করে লাশ বয়ে এনেছি যে কবর খুঁড়তে হবে?'

এমন বোকাবোকা প্রশ্ন করে জনি নিজেই লজ্জা পেয়ে গেছে। নিজ থেকেই তাই স্কয়ার সেপের গর্ত খোঁড়া শুরু করেছে। আসলাম নির্দেশ দিয়েছে গর্তের গভীরতা বুক সমান হওয়া পর্যন্ত গর্ত খুঁড়তে। ওদের কাজটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে জাহাঙ্গীর। পিটমোড়া করে হাত বাঁধা। গত দুদিন ধরে এই অবস্থায় আছে। হাতটা এত শক্ত করে বাধা যে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হাতের অস্তিত্বটাই সে আর টের পাচ্ছে না।

জাহাঙ্গীর বসে আছে অদূরে একটা উঁচু ঢিবির উপরে। একটা তন্দ্রার মতো ভাব থাকলেও নার্ভটা পুরো সজাগ আছে, কী ঘটতে যাচ্ছে তার সাথে কিছুক্ষণের মধ্যে এই বিষয়ে তার পুরো ধারণা রয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে বার কয়েক সে চেষ্টা করছে সেই জায়গাটা দেখার, যেখানে সে সুব্রত কুণ্ডুকে পুতে ফেলেছিল। নদীর এই পাড়টায় প্রচুর ঘাস গজানোর ফলে আলাদা করে কোনো কিছু বোঝার উপায় নেই। এটা এমন একটা জায়গা যেখানে সুব্রত জাহাঙ্গীর আর ডেভিডের মতো লোকদের জীবনে মাত্র দুবার আসতে হয়। প্রথমবার মারার জন্য আর শেষবার মরার জন্য। এবং আজ জাহাঙ্গীরের শেষ দিন আর ডেভিডের প্রথম দিন।

আসলাম জনি আর কিবরিয়া খুব মনোযোগ দিয়ে গর্ত খুঁড়ছে। তার চেয়েও বেশি মনোযোগ দিয়ে জাহাঙ্গীর তাদের কাজ দেখছে। গর্তের গভীরতা নেমেছে হাঁটু পর্যন্ত। কুণ্ডু বেশি সময় পায়নি। কুণ্ডুর জন্য গর্তটা আগেই খোঁড়া ছিল। সব ব্যবস্থা শহীদ চেয়ারম্যান আগেই করে রেখেছিল। জাহাঙ্গীর বেশ সময় পাচ্ছে। হাঁটু থেকে মাজা তারপর বুক সমান হতে কত সময় লাগবে কে জানে। এসব আনাড়ি লোকজন নিয়ে ডেভিড কীভাবে সব সামলাবে জাহাঙ্গীর ভেবে পায় না। নৌকা থেকে পাড়ে নামার পর থেকে ডেভিডের আর কোনো দিকে কোনো মনোযোগ নেই। ওদের থেকে একটু দূরে সরে কারো সাথে ফোনে খুব মনোযোগ দিয়ে কথা বলছে। একমাত্র জাহাঙ্গীর জানে ডেভিড এখন কার সাথে কথা বলছে।

কথা শেষ করে নদীর দিকে মুখ করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ডেভিড। যেন জাহাঙ্গীরকে নিয়ে পাশে কী হচ্ছে সে বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই। শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে

দেখে নিল ওদের খোঁড়া গর্তের গভীরতা কতটুকু হলো। শুধু এই জিনিসটাই জাহাঙ্গীর মানতে পারে না। তুমি যেই হও না কেন জাহাঙ্গীরকে পাত্তা দিতে হবে। এটা ডেভিডের জানার কথা। তাই হয়তো ইচ্ছে করেই জাহাঙ্গীরকে পাত্তা দিচ্ছে না। জাহাঙ্গীরের ভেতরটা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। গর্ত জনির কোমর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কঠিন খুনির দৃষ্টি নিয়ে পেছন থেকে ডেভিডের দিকে স্থির তাকিয়ে আছে জাহাঙ্গীর। হঠাৎ নদীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ডেভিড সরাসরি তাকাল জাহাঙ্গীরের দিকে। ভেতরে ভেতরে একটু চমকে গেছে ডেভিড। জাহাঙ্গীরের চোখের আগুন আর ঘৃণা এক মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করে গেছে ডেভিডকে। চোখ নামিয়ে ফেলল জাহাঙ্গীর। হনহন করে হেঁটে এসে ডেভিড বসল জাহাঙ্গীরের পাশে। নীরবে দুজনে দেখছে ওদের গর্ত খোঁড়ার কাজ। মৃদু বাতাসে কাশের ঝোপগুলো শনশন আওয়াজ তুলছে, দূরে কোথাও ডেকে উঠল একটা নিঃসঙ্গ দোয়েল, এর মাঝে মাটি কোপানোর ভোঁতা শব্দ ছাড়া পুরো পৃথিবী যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। খুব নরম গলায় ডেভিড জিজ্ঞেস করল—

'সিগারেট খাবি?'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে জাহাঙ্গীর বলল 'ধরা'।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরাল ডেভিড। গুনে গুনে তিনটা টান দিয়ে লাগিয়ে দিলো জাহাঙ্গীরের ঠোঁটে। জাহাঙ্গীর লম্বা শ্বাসে ফুসফুস ভরে টেনে নিল সিগারেটের ধোঁয়া।

পরম তৃপ্তির সঙ্গে সিগারেট টানতে টানতে জাহাঙ্গীরের ভেতরে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। নিকোটিনের বিষ জাহাঙ্গীরের মধ্যে এনে দিলো স্বাভাবিক মানুষের মতো ভাবনা। আবেগে আক্রান্ত হতে গিয়ে খুক খুক করে কেশে উঠল। ডেভিড ওর মুখ থেকে সিগারেটটা সরিয়ে নিল। এই ফাঁকে কিছুক্ষণ কেশে নিল জাহাঙ্গীর। বাকি সিগারেটটা টানতে থাকে ডেভিড।

গর্ত এখন জনির কোমরের নিচে। ডেভিড সিগারেটটা লাগিয়ে দেয় জাহাঙ্গীরের ঠোঁটে, সে একটা লম্বা টান দেওয়ার পর সিগারেট সরিয়ে নিয়ে টানতে থাকে ডেভিড। আবার দেয়, কিন্তু এবার জাহাঙ্গীর মাথা নাড়ে। বাকি সিগারেট একাই ফুঁকতে থাকে ডেভিড। গর্তের নিচের দিকের মাটিটা নরম থাকাতে এখন খননটা দ্রুত হচ্ছে।

'একটা অনুরোধ রাখবি!'

ডেভিড জানে জাহাঙ্গীর তাকে এখন কী অনুরোধ করবে। তাই কথা ঘুড়িয়ে বলে, 'ভয় পেয়েছিস'!

অপমানটা গায়ে না মেখে কিছুটা মরিয়া হয়ে জাহাঙ্গীর বলে—

'তুই আমাকে গুলি করে মার ডেভিড, মাটি চাপা দিয়ে মারিস না।'

দুজনেই তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। কেন যেন ডেভিডের বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। নৈঃশব্দের মতো সেটা পাশ থেকে শুনতে পেয়েছে জাহাঙ্গীর।

'নিয়ম ভাঙা যাবে না রে।'

'তাহলে নতুন নিয়ম বানা।'

‘সে তো অনেক কঠিন কাজ, কর্মফল বদলানোর ক্ষমতা কী আমার আছে!’

দাঁতে দাঁত ঘষে খুব শান্ত স্বরে একটা জঘন্য গালি দিয়ে জাহাঙ্গীর বলে—

‘নিয়ম বদলাতে না পারলে এই ক্ষমতা আর সাম্রাজ্য দিয়ে তুই কী করবি।’

বলেই আবার গালি দেয় ডেভিডকে। এবার ডেভিডকে মা তুলে গালি দেয়, অনবরত গালি দিতেই থাকে। এসব ক্ষেত্রে ডেভিড খুব শান্ত হয়ে যায়। জাহাঙ্গীরের উদ্দেশ্যটা বোঝার চেষ্টা করে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ক্রুদ্ধ জাহাঙ্গীরের দিকে। জাহাঙ্গীর তাকে রাগাতে চায়। সে চায় ডেভিড রাগের মাথায় তাকে গুলি করে মারুক। কাজ ফেলে ওরা তিনজন তাকিয়ে থাকে ডেভিড আর জাহাঙ্গীরের দিকে। ডেভিড লক্ষ করে গর্তের গভীরতা জনির বুক ছুঁয়েছে। জাহাঙ্গীর অনবরত ডেভিডকে মা তুলে গালি দিয়েই যাচ্ছে। একনাগাড়ে গালি দিয়ে এখন হাঁপাচ্ছে জাহাঙ্গীর।

ডেভিড ডাক দেয়, ‘আসলাম।’

আসলাম দৌড়ে আসে।

ডেভিড ইশারা দেয়।

আসলাম জাহাঙ্গীরের চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করিয়ে টানতে টানতে গর্তের দিকে নিয়ে যায়। জাহাঙ্গীর আবার গালি শুরু করে। গর্তের ঠিক কাছে পৌঁছালে জাহাঙ্গীর প্রায় আর্তনাদের সুরে বলে—

‘এই থাম, থাম শেষবারের মতো তোকে আমার একটা কথা বলার আছে। কথাটা শোন ভাই ডেভিড।’

এই অনুনয়ে আসলাম ডেভিডের দিকে ঘুরে তাকায়। ডেভিড ইশারায় আসলামকে থামতে বলে। জাহাঙ্গীরকে গর্তের প্রান্তে দাঁড় করিয়ে দেয় আসলাম। যেখান থেকে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিলেই গর্তের মধ্যে পড়ে যাবে জাহাঙ্গীর। ধীরস্থিরভাবে হেঁটে এসে জাহাঙ্গীরের মুখোমুখি দাঁড়ায় ডেভিড।

মৃত্যুভয়ে ভীত জাহাঙ্গীরের চোখে-মুখে অনুনয়।

‘বল কী বলবি?’

এই কথার উত্তরে ডেভিডের মুখের উপর একদলা থুতু ছুড়ে মারে জাহাঙ্গীর। ডেভিডকে রাগানোর শেষ চেষ্টাটা ব্যর্থ হয়। ডেভিড তার শার্টের আস্তিন দিয়ে থুতু মুছে জাহাঙ্গীরের বুক বরাবর একটা লাথি মেরে গর্তে ফেলে দেয়।

‘এই মানুষটাকে আমাদের বাঁচাতে হবে।’ ঘন কাশের আড়াল থেকে ফিসফিস করে বলল জেনিফার।

‘আমাদের পক্ষে এখন কিছু করা সম্ভব নয়, আশেপাশের কোনো থানার কোনো নম্বর আমাদের কাছে নেই। আর নম্বর পেলেও পুলিশ যখন আসবে তখন কবরে যথারীতি ঘাস গজিয়ে যাবে।’

গায়ে গায়েঁষে বসা জেনির শরীর থেকে একটা অদ্ভুত সুগন্ধ পাচ্ছে কবি, গন্ধটাকে ঠিক কোনো পারফিউম বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এটাই এই ঝোপঝাড় জঙ্গলের গন্ধ। অস্থিরতা আর উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে জেনি।

‘তাহলে যা করার আমাদেরই করতে হবে। কুইক। এই মানুষটাকে আমাদের বাঁচাতে হবে।’

জেনির এই কথায় এবার ধাক্কা খেল কবি অনিন্দ্য আকাশ। এই মেয়ে বলে কী! চোখ-মুখ কঠিন করে কবি বলল, ‘আমাদের করতে হবে মানে? আমরা কী করব?’

‘দেখছ না একটা অসহায় লোককে ওরা জীবন্ত পুঁতে ফেলছে, এখন আমাদের কী করা উচিৎ?’

কঠিন দৃষ্টি নিয়ে তাকায় জেনি। এই দৃষ্টির অর্থ বোঝে কবি, তাই জেনিকে বোঝানোর মতো করে বলে, ‘শোনো জেনি, আমি যতটুকু বুঝেছি এরা ভয়ংকর অরগানাইজড ক্রিমিনাল। আমরা ওদের একটা খুনের সাক্ষী হতে চলেছি, তুমি কি মনে করো ওরা ওদের খুনের কোনো সাক্ষী-প্রমাণ রেখে দেবে? ওরা যদি এখানে আমাদের অস্তিত্ব টের পায়, তবে ওই গর্তের মধ্যে লোকটার সাথে সাথে আমাদেরকেও পুঁতে ফেলবে। এত সহজ একটা জিনিস তোমার মাথায় ঢুকছে না কেন জেনি?’

‘লোকটা এখনো বেঁচে আছে, এই মুহূর্তে আমরা ছাড়া লোকটাকে বাঁচানোর আর কেউ নেই। আমার চোখের সামনে একটা অসহায় নিরপরাধ লোককে হত্যা করা হচ্ছে আর আমি চুপচাপ বসে সেটা দেখছি, এমন গ্লানি নিয়ে আমাকে বাকি জীবন কাটাতে হবে?’

‘উই আর হেল্পলেস জেনি।’

‘নো, উই আর নট হেল্পলেস দেন দ্যাট পারসন।’

‘তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করে আরেক জনের জীবন বাঁচাতে চাও?’

এ কথায় অবাক হয়ে জেনি কবি অনিন্দ্য আকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

‘তাহলে কবিতায় এসব লেখো কেন?’

‘হোয়াট ডু ইউ মিন জেনি?’

‘আমি বলতে চাচ্ছি, তাহলে তুমি কেন কবিতায় লেখো মানুষের মুক্তির কথা, বিপন্ন মানুষের অধিকারের কথা, তোমার “মানুষ” কবিতার মধ্যে কেন তবে লিখেছ—

বন্ধু তোমার বেঁচে থাকার দাবিতে
আমার বুক হবে প্রাচীরের মতো
প্রতিবন্ধক
ঘাতকের লক্ষ বুলেট প্রতিহত হবে
এই বুকে...

এই তো তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষকে বাঁচানোর কথা বলেছ। তবে কেন বলেছ কবি?’

‘কবিতা আর বাস্তবতা এক নয় জেনি।’

‘হোয়াট! তার মানে তোমার কবিতায় বলা সব কথা মিথ্যে?’

স্তব্ধ হয়ে যায় কবি অনিন্দ্য আকাশ। কথা খুঁজে পায় না কী উত্তর দেবে এ প্রশ্নের। আমতা আমতা করে বলে, ‘না, তা হবে কেন? মিথ্যে হবে কেন!’

‘আমিও তাই বিশ্বাস করি। তোমার কবিতার প্রতিটি অক্ষর আমি বিশ্বাস করি। বেপরোয়াভাবে বিশ্বাস করি। সম্ভবত তোমার চেয়েও বেশি বিশ্বাস করি। তুমি নিজেও জানো না তোমার কবিতা আমাকে কতটা শক্তি দেয়, সাহস দেয়। আর এখন তুমি সেটাই দেখবে যে তোমার কবিতা কতটা শক্তিশালী। আমি যাচ্ছি ঐ অসহায় লোকটাকে বাঁচাতে।’

জেনির হাত চেপে ধরে কবি অনিন্দ্য আকাশ। মরিয়া হয়ে বলে, ‘জেনি, প্লিজ পাগলামো করো না!’

একটা মুচকি হাসি দিয়ে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে জেনি বলে, ‘তুমিই তো বলো কবিতা মানে পাগলামো আর সেটার জন্য তুমিই দায়ী।’

উঠে দাঁড়িয়ে কাশবনের ঝোপ মাড়িয়ে জেনি সেখান থেকে নদীর পাড়ের দিকে রওনা দেয় আর পেছন থেকে আতঙ্কিত কবি অনিন্দ্য আকাশ উত্তেজিত চাপা স্বরে বলতে থাকে, ‘জেনি, প্লিজ ডোন্ট...’

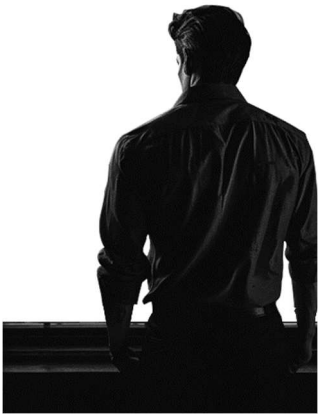

জাহাঙ্গীর গর্তে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনি, কিবরিয়া আর আসলাম মিলে গর্তে মাটি ঢালতে শুরু করেছে, ঠিক তখন কাশবন ফুঁড়ে ওদের দিকে একটা মেয়েকে ছুটে আসতে দেখে ওরা চমকে যায়। সামলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার হাতে হাতে বের হয়ে এসেছে নাইন এমএম পিস্তল। আসলাম জনি আর কিবরিয়া তিনদিকে ছড়িয়ে পজিশন নিয়ে ফেলেছে। প্রথম রিফ্লেক্সে পিস্তল তাক করলেও মেয়ে দেখে ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে ফেলছে ডেভিড। এখন সবার নজর অন্য আরও কাউকে খুঁজছে, সবাই নিশ্চিত হতে চাইছে মেয়েটি একা নাকি সাথে আরও কেউ আছে। জেনিফার এসে দাঁড়ায় ডেভিডের সামনে। পিস্তল উঁচিয়ে ছুটে আসে আসলাম। মুখ খিঁচিয়ে আসলাম জিজ্ঞেস করে, 'এই তুই কেডা? কই থেকে এখানে আসছোস? কেন আসছোস? কে পাডাইছে তোরে?'

জেনিফার একটা নীল জিন্সের ট্রাউজার পড়া, গায়ে সাদা ফুলতোলা ঢিলেঢালা শার্ট, গলায় প্যাঁচানো স্কার্ফ, চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা, পায়ে মোকাসিন, পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চতার প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পূর্ণ সুন্দরী নারীকে তুই তোকারি করে করা প্রশ্নগুলো অবস্থাটাকে আরও জটিল করে ফেলেছে। জেনি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছে এই জায়গাটার উপরে পুরো কর্তৃত্ব এই ক্যাপ পরা লোকটির হাতে। তাই আসলামকে পাত্তা না দিয়ে সরাসরি ডেভিডের দিকে তাকাল। ডেভিড আসলামকে বলল, 'ওর ব্যাগটা সার্চ কর আসলাম।' জেনিফারের কাঁধে ঝোলানো আর্মানির হ্যান্ডব্যাগটা একটানে কেড়ে নিয়ে মুখ খুলেই উপুড় করে ফেলল। ভেতরে মেয়েলি জিনিস পত্রের সঙ্গে সঙ্গে ওর আইফোনটা টুপ করে পড়ল। ফোনটা কিবরিয়া তুলে দিলো ডেভিডের হাতে।

'ডোন্ট অরি অ্যাবাউট মি প্লিজ, আমি সব বলছি।'

ডেভিড ফোনটা ওপেন করার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে সেটা লক করা। জেনিফার বলে, 'আমি আমার বন্ধুর সাথে ন্যাশনাল পার্কে ঘুরতে এসেছিলাম। অ্যাডভেঞ্চার করতে যেয়ে বেশি ভেতরে চলে এসে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। আপনাদের দেখে আমি লুকিয়ে ছিলাম। যখন দেখলাম আপনারা এই লোকটিকে মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করতে যাচ্ছেন তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। আমার বিবেক বলেছে লোকটিকে আমার বাঁচানো উচিত...'

এমন সিরিয়াস মুহূর্তে বিবেকের কথা শুনে জনি, কিবরিয়া আর আসলাম পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। জনির মুখে ছড়িয়ে পড়ে তাচ্ছিল্যের হাসি। বিস্ময়ের ঘোরে জাহাঙ্গীরের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, ঝুলে পড়ছে চোয়াল। ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলার পর জনি গর্তে নেমে জাহাঙ্গীরের দুই পা বেঁধে দিয়েছিল। সেই বাঁধা পা নিয়ে

কোনো ক্রমে গর্তের ভেতরে উঠে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো আসমান থেকে কোনো একটা পরি নেমে এসেছে তার জীবন বাঁচাতে। ধরা পড়ার পর থেকে নিজের জীবন নিয়ে বাঁচার কোনো আশা করেনি জাহাঙ্গীর, কারণ সে জানে তার গন্তব্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। কিন্তু এখন প্রবলভাবে তার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।

জেনিফার আকুতি নিয়ে ডেভিডকে বলে, 'প্লিজ আপনারা লোকটিকে জানে মারবেন না, প্লিজ ছেড়ে দিন।'

ডেভিড জেনিফারের কথা পাত্তা না দিয়েই ফোনটি এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আনলক দিস ফোন।'

জেনিফার তার বৃদ্ধাঙ্গুলী লাগিয়ে ফোনটা আনলক করে ডেভিডের হাতে দেয়, ডেভিড খুব দ্রুত জেনিফারের কল হিস্ট্রি আর ম্যাসেঞ্জার ইনবক্স চেক করে।

লাস্ট কথা বলছে পোয়েট অনিন্দ্য আকাশ নামের কারো সাথে। ঠিক তখনই সবাইকে চমকে দিয়ে ফোনটা বেজে ওঠে। ফোনের স্ক্রিনে লেখা উঠেছে–পোয়েট অনিন্দ্য আকাশ।

টানটান উত্তেজনায় সতর্ক হয়ে উঠেছে সবাই। ফোনটা বেজে যাচ্ছে। ডেভিড তার পিস্তলটা জেনিফারের কপাল বরাবর তাক করে বলল, 'স্পিকার অন করে খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলেন, উলটা পালটা করলেই গুলি করে দেবো।' ফোনটা জেনিফারের হাতে দেয়, জেনিফার খেয়াল করল, ডেভিড তাকে 'আপনি' করে বলল।

দূর থেকে কবি অনিন্দ্য আকাশ ওদের কোনো কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না। তবে একটা অনুমান করতে পারছে যাই ঘটুক না কেন এই লোকগুলোকে এই ম্যাসেজটা দিতে হবে যে জেনি আসলে একা না। জেনি কারো সাথে এখানে এসেছে। ফোনের নেভিগেশনে জেনির শেষ অবস্থানের রেকর্ডটা থাকবে। এসব ক্ষেত্রে অপরাধীরা ফোনের সুইচ অফ করে ফেলে। তাই দূর থেকে জেনির ফোন নাড়াচাড়া করা দেখেই ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছে কল করবে। কবি অনিন্দ্য আকাশের চরিত্রের সবচেয়ে কঠিন দিক হচ্ছে, সে কখনো রাগে না আর বিপদে-আপদে তার মাথা খুব ঠান্ডাভাবে কাজ করে, স্বাভাবিক সময়ের চেয়েও ভালো কাজ করে।

ফোনটা বাজছে এখান থেকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে অনিন্দ্য আকাশ। আর এটাও দেখতে পাচ্ছে চারটা ক্ষুধার্ত পিস্তল তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে জেনির দিকে। জেনি বলল, 'হ্যালো'।

'ওহ্ জেনি সোনা, কোথায় তুমি?

কখন থেকে তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না। শোনো আমি চারটা সোনালি প্রজাপতি ধরেছি তোমার জন্য, সেগুলোকে তোমার চুলের মধ্যে বসিয়ে ছবি তুলব, একটাকে বসাব তোমার নাকে... হা হা হা... এনিওয়ে হোয়ার আর ইউ রাইট নাও? আর ইউ ওকে?'

‘আই এম ওকে বেবি, তুমি রিসোর্টের রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করো, আই উইল বি ব্যাক সুন।’

‘হারি বেইবি, ইউর পোয়েট ইজ ডাইং ফর ইউ...’

ফোনটা কেটে দেয় জেনি।

কবি অনিন্দ্য আকাশের বুদ্ধিমত্তায় জেনি অবাক এবং মুগ্ধ।

জেনির বিষয়ে ওদের সন্দেহ এখন অনেকখানি কেটে গেছে। পুরোপুরি কাটেনি। এরা এমন এক গোত্রের মানুষ যারা বাস করে সন্দেহের ভেতরে। কাকতালীয়ভাবে এখানে এলেও জেনিকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

জেনি আবার অনুরোধ করতে শুরু করে, ‘প্লিজ এই নিরপরাধ অসহায় মানুষটিকে আপনারা মারবেন না। প্লিজ ছেড়ে দিন।’

জাহাঙ্গীরের মতো কুখ্যাত এবং ভয়ংকর গ্যাংলিডারকে বলছে ‘নিরপরাধ অসহায়’ ওদের পরস্পরের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে দেখেই বোঝা যায় ওরা এমন অদ্ভুত কৌতুক এই জীবনে আর শোনেনি।

ডেভিড তাচ্ছিল্য নিয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘আপনি ওকে চেনেন, না চিনে কীভাবে অসহায় আর নিরপরাধ ভাবছেন?’

‘না, আমি ওনাকে চিনি না। তবে এটা বুঝি জালিম আর মজলুমের মাত্র দুটি পরিচয় থাকে। একজন অমানুষ আর একজন মানুষ।’

কথাটায় ডেভিড ধাক্কা খায়।

ডেভিড জাহাঙ্গীরের মতো কেরানীগঞ্জের বস্তি থেকে উঠে আসেনি। ডেভিড পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে পড়া অবস্থায় সশস্ত্র ছাত্র রাজনীতির ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে। নিরস্ত্র অবস্থায় চারজন অস্ত্রধারী লোকের সামনে এমন সাহসী কথার অপমানটা ডেভিটকে স্পর্শ করে। কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়ে ডেভিড পাল্টা প্রশ্ন করে—

‘আপনার কী ওকে দেখে মানুষ মনে হয়?’

‘অবশ্যই, উনি একজন মানুষ, অসহায় মজলুম মানুষ।’

আবারও জেনিফারের কথার বিপরীত অর্থটাই ডেভিডকে আঘাত করছে। জাহাঙ্গীর মজলুম হলে ডেভিড কী তাহলে জালিম। অধৈর্য হয়ে গেছে আসলাম। রেগে গিয়ে বলে, ‘বস এত কথা বাড়ায়া লাভ নাই এই মাতারিকে সহ শোয়াইদি!’

আসলামের কথা যেন ডেভিডের কানে যায়নি। মেয়েটি সূক্ষ্মভাবে ডেভিডের ব্যক্তিত্বে আঘাত করেছে। ডেভিড সেটার প্রত্যুত্তর দিতে চায়—

‘এর নাম জাহাঙ্গীর, পেপার-পত্রিকায় নিশ্চয় এর নাম শুনেছেন। কেরানীগঞ্জের জাহাঙ্গীর। দুদিন আগপর্যন্ত পুরো শহরটা ছিল এর নিয়ন্ত্রণে, কম করে হলেও শখানেক মানুষ হত্যা আর গুম করেছে। ঠিক এখনই যদি সুযোগ পায় আমাদের সবাইকে খুন করতে সে এক মুহূর্ত দেরি করবে না। তারপরেও আপনি কীভাবে তাকে মানুষ বলেন?’

‘মানুষকে হত্যা করার মতো জঘন্য ক্ষমতা যতদিন ওর হাতে ছিল ততদিন সে হয়তো মানুষ ছিল না। কিন্তু আজ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেন, মৃত্যু ভয়ে ভীত কেমন এক অসহায় মানুষ সে। দেখেন, একদম অবিকল মানুষ। সে জীবনে যত অপরাধ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য হলেও এই লোকটির বেঁচে থাকা দরকার। আজ নতুন জীবন পেয়ে যত প্রায়শ্চিত্ত করবে ততই সে পুড়ে পুড়ে মানুষ হয়ে উঠবে। প্লিজ, তাকে সেই সুযোগটা অন্তত দিন... প্লিজ।’

জেনির এসব কথায় জাহাঙ্গীরের বুক উথলে বের হয়ে আসে কান্না। এখন সে আর কুখ্যাত খুনি গ্যাংলিডার নয়। হাউমাউ আর্তনাদে কাঁদছে অসহায় এক মানুষ।

‘ডেভিড ভাই আমার, প্লিজ একটা সুযোগ আমাকে দে ভাই। আমি সব ধান্দা ছেড়ে দিব। আমি দেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাব, তুই আমাকে কোনোদিন আর দেখবি না, আমার জীবনটা ভিক্ষা দে ভাই। দে না ভাই আমার জীবনটা ভিক্ষা, দে ভাই ডেভিড...’

ডেভিড তাকিয়ে থাকে জাহাঙ্গীরের দিকে। অবাক হয়, এটা কী সেই জাহাঙ্গীর, যার ভয়ে কাঁপত পুরো ঢাকা শহর। জাহাঙ্গীর নাকের পানি চোখের পানি এক করে একটা অবুঝ শিশুর মতো কাঁদছে। ডেভিডের দৃষ্টি অনুসরণ করে জেনি বলে—

‘প্লিজ একটা সুযোগ দিন লোকটাকে, জাস্ট গিভ হিম এ চান্স।’

আসলামের ধৈর্যের বাদ ভেঙে যায়, চাপা রাগে বলে, ‘বস, এই নাটক শেষ করেন, আর দেরি কইরেন না...’

জনি একটা গালি দিয়ে জাহাঙ্গীরকে চুপ করতে বলে। কিবরিয়া কোঁদাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে গর্তে মাটি ঢালতে। জেনি মরিয়া হয়ে চালিয়ে যাচ্ছে তার চেষ্টা। ডেভিডের পুরো মনোযোগটা নিজের দিকে নিয়ে বলে—

‘মানুষ আর অমানুষের মধ্যে একটাই পার্থক্য, মানুষ ক্ষমা করতে পারে, অমানুষ সেটা পারে না...’

ডেভিড স্থির তাকিয়ে থাকে জেনির চোখের দিকে। জেনি যেন একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলো। ‘একশটা খুন করেছে বলে এই লোকটিকে যদি আপনার মানুষ বলতে অসুবিধা হয়, তবে কে জানে আজ এই লোকটাকে খুন করে আপনার এই সংখ্যাটা হবে একশ এক। প্লিজ ক্ষমা করে দিন, জীবনে অন্তত একবার মানুষ হয়ে উঠুন, ক্ষমা করে দিন প্লিজ।’

আসলাম চিৎকার করে বলে, ‘এই মাতারি চুপ কর, বস হুকুম দেন...’

পারিপার্শ্বিকতা ভুলে ডেভিড আর জেনির মধ্যে চলছে একটা বাক্‌যুদ্ধ।

কণ্ঠে গভীর শীতলতা নিয়ে ডেভিড জিজ্ঞেস করে—

‘আমাকে কী মানুষ মনে হয় না?’

‘যতক্ষণ না আপনি ক্ষমা করছেন ততক্ষণ না।’

‘এই অমানুষের পৃথিবীতে আমার মানুষ হয়ে কী লাভ?’

‘মানুষ হলে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়, আর অমানুষের জন্য শুধুই ঘৃণা।’

‘আমি যে পৃথিবীর বাসিন্দা যেখানে কোনো মানুষ থাকে না, তাই কোনো মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার প্রয়োজন আর সুযোগ কোনোটাই আমার নেই। আজ আমি একে ছেড়ে দিলে আমার দলের লোকই আমাকে ঘৃণা করবে।’

‘আপনি যে পৃথিবীর বাসিন্দা সেটাকে মানুষের বসবাসের জন্যই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, যদিও কখনো কখনো সেখানে শয়তানও রাজত্ব করে। শয়তানের হৃদয় কঠিন, সে ক্ষমা করতে জানে না। ক্ষমাশীলতা আল্লাহর গুণ। যে ক্ষমা করে সে আল্লাহর বন্ধু। যে ক্ষমার গুণ লাভ করে সে প্রবল এক আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করে। আপনি সেই শক্তি অর্জন করেন দেখবেন, আপনার পরাক্রমের কাছে কেউ টিকতে পারবে না।’

ডেভিড তার শেষ চ্যালেঞ্জটা ছুড়ে দিয়ে জেনিকে জিজ্ঞেস করে—

‘আপনি কী আমার মতো মানুষকে ভালোবাসবেন?’

কোনো দ্বিধা ছাড়াই জেনি উত্তর দেয়, ‘যদি আপনি ক্ষমাশীল হন!’

‘আর ইউ সিওর?’

দৃঢ়তার সাথে জেনি বলে, ‘অ্যাবসলিউটলি।’

জেনি আর ডেভিড পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। জাহাঙ্গীরের আর্তচিৎকার বন্ধ হয়ে গেছে। কী ঘটতে যাচ্ছে আশঙ্কায় জনি, কিবরিয়া আর আসলাম স্তব্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ চারদিক অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় ডুবে যায়।

এই প্রথমবারের মতো আন্ডারওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে পুরাতন নিয়মটা আজ ভেঙে দিলো ডেভিড।

‘আসলাম।’

‘ইয়েস বস।’

‘জাহাঙ্গীরকে ছেড়ে দে।’

‘না বস না... এই ভুল করবেন না, প্লিজ বস এটা করবেন না।’

ঝট করে আসলামের দিকে ঘুরে তাকায় ডেভিড। ডেভিডের কঠিন শীতল দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই শামুকের মতো গুটিয়ে যায় আসলাম।

‘সরি বস... ওকে বস’ বলতে বলতে লাফ দিয়ে গর্তের গভীরে নামে, পকেট থেকে ছুরি বের করে জাহাঙ্গীরের হাতের পায়ের বাঁধন কেটে দেয়।

জনি আর কিবরিয়া মিলে তাকে গর্তের ভেতর থেকে টেনে ওঠায়। জাহাঙ্গীর হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আর কৃতজ্ঞতায় ডেভিডের পা চেপে ধরে। টানটান হয়ে শুয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করতে করতে চুমু খায় ডেভিডের জুতায়।

‘থ্যাংক ইউ ডেভিড, আমার জীবন ভিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি সারাজীবনের জন্য তোর গোলাম হয়ে গেলাম। আমি এই দেশ ছেড়ে চলে যাব, আমাকে আর কোনোদিন তুই দেখবি না।’ জেনিফারের দিকে তাকিয়ে বলে ‘থ্যাংক ইউ মা...’ এবার ধীরে ধীরে জাহাঙ্গীর পেছনে সরতে থাকে। সন্দেহ আর আতঙ্ক নিয়ে একপা দুইপা করে পেছনে সরতে থাকে আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে। জাহাঙ্গীরের তখনো

বিশ্বাস হয় না। আন্ডারওয়ার্ল্ডের বেইমানি প্রতারণা আর অবিশ্বাস কতটা ভয়াবহ সেটা জাহাঙ্গীর খুব ভালোভাবেই জানে। যেকোনো মুহূর্তে ডেভিড আর তার লোকজন মত বদলে গুলি চালিয়ে বসতে পারে। পেছনে সরতে সরতে একটা নিরাপদ দূরত্বে এসে দৌড় লাগায়। প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে গজারি বনের মধ্যে হারিয়ে যায়।